দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৫ ও ৩৬ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৮, ২০১৯

বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম*

বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির প্রাণ, বলা ভালো, প্রাণভ্রমর। এই প্রাণভ্রমর আমাদের বাঙালি বানিয়েছে। বাঙালি জাতি তৈরি হয়েছে এর জন্যে। এই ভাষা যদি কাঁচা থাকত, এ ভাষার বিকাশ-ধারায় যদি জগৎবরেণ্য মানুষের জন্ম না হত, তবে এই জাতি গড়ে উঠত কি না, জোর করে কিছু বলা যায় না। কাজেই এই ভাষা যদি যথার্থ অর্থে বাঁচে তবে বাঙালি জাতি বাঁচবে। এমন আশায় বাংলা ভাষার বিকাশ ও মুক্তির প্রসঙ্গ উঠেছিল উনিশ শতকে। কী ভাবে ও কী উপায়ে বাংলা ভাষার উন্নতি ও মুক্তি সম্ভব–বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সমস্ত বুদ্ধি ও মনন ছিল এই জিজ্ঞাসা ও কর্মতৎপরতায় সপ্রাণ। এ বিষয়ে অপূর্ব প্রশ্ন তুলেছিলেন চিন্তাসংস্কারক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। এ ব্যাপারে তাঁর মনোভাবটা ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানীর–রোগ নির্ণয় থেকে তার নিরাময় পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করবার মনোভাব ছিল যাঁর মধ্যে আমৃত্যু। অর্থাৎ বাংলা ভাষার বিকাশে সমস্যা কোথায়, বাধা কীসে–এটা খুঁটিয়ে দেখা ছিল তাঁর প্রথম লক্ষ্য। অপরদিকে কী ভাবে ও কী কর্তব্য পালন করলে এ ভাষা মুক্তি পেতে পারে সভ্য দুনিয়ার মাঝে, সেটা বিচার করে দেখা ছিল তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্য। বাংলা ভাষার অপরিণত অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। সেটাই ছিল তখন তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে তিনি তখন বাংলা ভাষার দুটো প্রধান প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতে, তখন প্রথম প্রতিবন্ধকতা ছিল এই যে, যাঁরা বিলক্ষণ আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তি, তাঁরা বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীন। শুধু তাই নয়, তাঁরা মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবহেলা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতেও কুণ্ঠাহীন। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের এই বিবেচনাহীন তৎপরতা ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের মতে বাংলা ভাষার উন্নতির পক্ষে প্রথম ও সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধক। তিনি সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন,

> ইংরাজি ভাষাবিজ্ঞ বঙ্গদেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরাজি ভাষায় সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, বার্তাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে পুস্তক না লিখিয়া এবং বক্তৃতা না করিয়া যদ্যপি তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকল বিষয়ে পুস্তক লিখেন ও বক্তৃতা করেন তাহা হইলে, তাঁহারা বঙ্গভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের দেশের সুশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যতকাল বঙ্গভাষা বিশিষ্ট রূপে চর্চা ও অনুশীলন করিতে আরম্ভ না করিবেন ততকাল বঙ্গভাষা প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।[১]

* সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

এ কথা আজ ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, সেকালে ছিল ইংরেজির প্রতিপত্তি ও ইংরেজির রাজত্ব। এটা মেনে নেবার পক্ষে আজ আর কোনো রকম যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নেই। বাঙালি সন্তানদের মধ্যে সেকালে যাঁরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন, তাঁরা ইংরেজিতে লিখতেন, ইংরেজি পড়তেন, ইংরেজি বলতেন, ইংরেজি সাম্রাজ্যে ঘুমিয়ে ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতেন। ইংরেজি ছাড়া আর যে কিছু করবার আছে, এটা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। অক্ষয়কুমার বলেছেন, এই ইংরেজি নবিশেরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র ইংরেজি বোল-চালই মারতেন। বাইরে না-হোক মনে মনে তাঁরা ইংরেজি ভাষাকেই তাঁদের মাতৃভাষা ঠাওরিয়ে ছিলেন! তাঁরা ভুলে যেতে চাইছিলেন আত্মপরিচয়। অক্ষয়কুমার কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন যে,

> ইংল্যান্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশ ভাষা সকল ঐ পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা একথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন।[২]

অক্ষয়কুমার এই পরিবেশে থেকে, এই পরিবেশ জেনে অত্যন্ত ধৈর্য ও বিনয়ের সঙ্গে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিজের ভাষা বিলুপ্ত হবে আর পরের ভাষা সে জায়গা দখল করবে, 'ইহার পর অলীক কথা আর নাই।' তিনি বলেন, 'এ ভ্রম খণ্ডনের নিমিত্তে এই মাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আত্ম ভাষায় কি পর ভাষায় জ্ঞান উপার্জন সুলভ হয়? এ বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় স্থলই বোধ হয় না–ইহা প্রশ্নেরও যোগ্য নহে।'[৩] তবে তিনি এটা মনে করতেন যে, বাংলা ভাষায় প্রতিভাসম্পন্ন 'বঙ্গীয় গ্রন্থকার উদিত হইবার সম্ভাবনা' নেই যতক্ষণ না এ ভাষা 'বিশিষ্ট রূপে চর্চা ও অনুশীলন' করা হয়। তিনি একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, ঐকান্তিক আগ্রহে দীর্ঘকাল আমাদের ক্লান্তিহীন কঠোর মানসিক পরিশ্রম ও অনিঃশেষ কর্মপরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে। বাংলা ভাষার উন্নতির পক্ষে এর বিকল্প পথ তিনি দেখতে পাননি। অক্ষয়কুমার দেখিয়েছেন, অবহেলা, উপেক্ষা আর অবজ্ঞা বাংলা ভাষার পরম শত্রু। এই পরম শত্রুকে যত্নের সঙ্গে আগলিয়ে রাখলে বাংলা ভাষার উন্নতি অসম্ভব। এ ব্যাপারে

তিনি এক-আধজনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি। বাঙালি শিক্ষিত লোকমাত্রই তাঁর এই বক্তব্যের লক্ষ্য। এই গেল একদিক। অন্যদিকে,

> বঙ্গভাষার উন্নতির পক্ষে দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বাঙ্গালীদিগের স্বাধীনতাশূন্যতা। স্বাধীনতা ভাষার উন্নতিসাধনের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। স্বাধীনতাশূন্যতা ভাষার উন্নতিপক্ষে একটি মহান ও প্রধান প্রতিবন্ধক। আমরা দেখিতে পাই যাহার যেরূপ মনের অবস্থা তাহার ভাষাও সেইরূপ হইয়া থাকে। যিনি সম্রাট কিম্বা রাজা, তাঁহার হৃদয় প্রভুত্ব ও রাজকীয় মহত্ত্বে পরিপূর্ণ এবং তাঁহার ভাষাও তদনুরূপ প্রভুত্ব ও মহত্ত্বসূচক। যিনি প্রভু, তাঁহার ভাষাও প্রভুত্বব্যঞ্জক। যে দাস তাহার ভাষাও দাসত্বব্যঞ্জক। যে ব্যক্তি স্বাধীন তাহার ভাষাও সেইরূপ মুক্ত এবং যে ব্যক্তি পরাধীন তাহার ভাষাও সেইরূপ বদ্ধ। সেই প্রকার যে জাতির স্বাধীনতা আছে, সেই জাতির ভাষা মুক্ত, সুতরাং উন্নত। আর যে জাতির স্বাধীনতা নাই সেই জাতির ভাষা বদ্ধ। সুতরাং অনুন্নত ও অপরিমার্জিত। যে দেশের লোকেরা স্বাধীন তাহারা স্বাধীনভাবে, নির্ভয়ে, মুক্তভাবে তাহাদিগের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিচালনা করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদের ভাষা শীঘ্র পরিপুষ্ট ও পরিমার্জিত হইয়া উন্নত হয়, আর যে দেশের লোকেরা স্বেচ্ছাচারী কিন্তু যথেচ্ছাচারী রাজার অধীন এবং সকল প্রকার স্বাধীনতা পরিভ্রষ্ট তাহারা সর্বদা ভয়ে কম্পিত, তাহাদের হৃদয় ও মন বদ্ধ; স্বাধীনতাজনিত মনের নির্ভয়তা ও মুক্তভাব তাহাদিগের মন হইতে একেবারে পলায়ন করিয়াছে সুতরাং তাহাদিগের ভাষার বিশেষ রূপে অনুশীলন ও চর্চা হইতে পারে না, তন্নিমিত্ত উহা পরিমার্জিত ও উন্নত হইতে পারে না। যে জাতি স্বাধীন সে জাতির লোকেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে কোন বাধা ও বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় না, তাহারা সকল সময়ে সকল অবস্থায় যাহা করে তাহা অবাধে মন খুলিয়া বলিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগের চিন্তাস্রোত উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং চিন্তাশক্তি তেজস্বী, প্রখর ও দৃঢ় হয়, তজ্জন্য তাহাদের ভাষায় নূতন নূতন কথার সৃষ্টি হইতে থাকে এবং উহা নূতন নূতন ভাবে সুসজ্জিত হইতে থাকে; সেইরূপে তাহাদের ভাষা ক্রমশ উন্নত, বিশুদ্ধ পরিমার্জিত হইতে থাকে। কিন্তু যে জাতির স্বাধীনতা নাই সে জাতির লোকেরা স্বাধীনরূপে চিন্তা করিতে পারে না, স্বাধীনভাবে, মন খুলিয়া সকল কথা বলিতে পারে না, ভয়ে তাহাদের মুখ বদ্ধ থাকে, সুতরাং তাহাদিগের চিন্তাশক্তি অবাধে পরিচালিত হইতে না পারাতে উহা তেজস্বী হইতে পারে না, তজ্জন্য তাহাদের ভাষাও উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না।[৪]

এই বক্তব্যের পরে, অক্ষয়কুমার বাস্তব ইতিহাস থেকে নজির দেখিয়ে লিখেছেন,

> গ্রীস দেশে যে সময়ে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল তৎকালেই গ্রীসে সক্রেটিস, প্লেটো, সফোক্লিস, ইউরিপাইডিস, ডিমসথিনিস প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক দার্শনিক কবি নাটককার বক্তা ও অন্যান্য নানা বিষয়ক গ্রন্থকর্তা উদিত হইয়াছিলেন। রোমীয় জাতি তখন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা সমস্ত ইউরোপের ও অধিকাংশ আসিয়ার অধিপতি হইয়াছিলেন তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে সিসিরো, বর্জিল, হোরেস প্রভৃতি অসাধারণ লেখকগণ উদিত হইয়াছিলেন। চতুর্দশ লুই-এর রাজত্বকালে ফ্রান্সদেশে একতা সংস্থাপিত হয় এবং প্রজারা প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়; তাঁহারই রাজত্বসময়ে কর্ণিল, রেসিন, মোলিয়ার, লাফণ্টেন, ফেনেলন, বয়েলু প্রভৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসি লেখকগণ উদিত হয়েন। ইংলন্ডের সম্রাজ্ঞী এনের রাজত্বকালে একট অব সেটেলমেন্ট (Act of Settlement) নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে ইংরাজদিগের স্বাধীনতা সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয়, উহার পর হইতে ইংলন্ডে পোপ, স্টীল, এডিসন, জনসন প্রভৃতি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন অমর লেখকগণ উদিত হইতে লাগিলেন।[৫]

এই দুই সূত্র উল্লেখ করে অক্ষয়কুমার লিখেছেন, 'যে জাতির ভাষা উন্নত সে জাতি অন্যান্য সকল বিষয়েই উন্নত হইয়া থাকে। ভাষা উন্নত হইলে জাতীয় উন্নতি এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী।'[৬] এ প্রসঙ্গে একটা জরুরি তথ্য এই যে, অক্ষয়কুমার যে বয়সে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* (১৮৪৩) সম্পাদনা ত্যাগ করেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) সেই বয়সে *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২) সম্পাদনা আরম্ভ করেন। বাংলা ভাষার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তিনি পত্রিকার 'পত্র সূচনা'য় বলেন যে, 'যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।'[৭] *বঙ্গদর্শন*-এর 'পত্র সূচনা'র এই ভাষা ও ভঙ্গিটা বাদ দিলে দেখা যায়, এ বক্তব্য পুরোপুরি অক্ষয়কুমার দত্তের পুনরাবৃত্তি। তবে বাংলা ভাষার উন্নতির পক্ষে দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্যের সূত্রে অক্ষয়কুমার আর বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মৌল ও প্রধান পার্থক্য এই যে, শত্রু চিহ্নিতকরণে অক্ষয়কুমার কেবল কৃতবিদ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের অবহেলাকে দায়ী করেননি, এ অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনতাহীনতার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রে এই বেদনা ও রক্ত-ক্ষরণ অনুপস্থিত! মোটকথা, অক্ষয়কুমার তাঁর বক্তব্যে এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, 'জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে।'[৮] এজন্যে সুশিক্ষিত লোকের পক্ষে 'বহুবিদ্যার চর্চা' করতে হবে সেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, যেখানে রাষ্ট্রকে হতে হবে স্বাধীন আর মাতৃভাষার প্রতি থাকতে হবে তন্নিষ্ঠ অঙ্গীকার। এ কথা ভুলে যাওয়া এবং ভুলে থাকা হবে বাঙালির পক্ষে আত্মঘাতী।

২

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে উল্লিখিত দুই শত্রুকে চিহ্নিত করেছিলেন অক্ষয়কুমার মাত্র বাইশ-তেইশ বছর বয়সে। এ কথার প্রমাণ পেশ করা যাক। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯)

প্রতিষ্ঠার পরে এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন উনিশ বছরের যুবক অক্ষয়কুমার দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)-এর *আত্মজীবনীর* (১৮৯৮) সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, 'তত্ত্ববোধিনী সভা'য় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের যোগ দেওয়াটা ছিল একটি 'স্মরণযোগ্য ঘটনা'। কারণ, তিনি বলেন, এর থেকে 'উত্তরকালে অনেক গুরুতর ফল' উৎপন্ন হয়।[৯] কর্ম-নিপুণ আর জ্ঞান-উদ্দীপ্ত অক্ষয়কুমারকে পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০) প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল 'নিজ ধর্মে অনুগত থেকে যাতে ঈশ্বর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তার জন্যে এই পাঠশালা প্রতিষ্ঠা।'[১০] অক্ষয়কুমার চেয়েছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও বৈষয়িক বিষয়ে শিক্ষাদান।[১১] তিনি এই পাঠশালার অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। শিক্ষার্থীদের জন্যে লেখেন *ভূগোল* (১৮৪১) ও *পদার্থবিদ্যার* (১৮৫৬) বই। তাঁর মনের গড়নটা লক্ষ করবার মতো। বয়স কম কিন্তু মনটা পাকা। জ্ঞানের ভিত বয়সের অনুপাতে তখনো মজবুত ভিত্তি পায়নি হয়তো কিন্তু দৃষ্টিটা পরিষ্কার, আগ্রহটা আশ্চর্যজনকভাবে উচ্চায়ত। বিষয়টা বিজ্ঞান, ভাষাটা ইংরেজি নয়, বাংলা। মাতৃভাষাই লক্ষ্য। মাতৃভাষাই উদ্দিষ্ট।

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, সুদীর্ঘকালের বয়ে চলা মক্তব আর টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষাব্যবস্থা যখন পাঠশালায় রূপান্তরিত হল, ঠিক তখনই সেই পঠন-পাঠনে যুক্ত হলো আধুনিক বিজ্ঞান। বাঙলায় এবং বাঙালির শিক্ষাব্যবস্থায় ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সেই প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটল! বাঙালির ছেলেরা বাংলা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেল। আমাদের আধুনিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সূচিত হলো এক যুগান্তকারী নতুন মাত্রা। কী চেয়েছিলেন অক্ষয়কুমার? খুব পরিষ্কার হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্যটা। শিক্ষার্থীর অভাবে কলকাতায় বেশি দিন স্থায়ী করা গেল না 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'। স্থির হলো এটা প্রতিষ্ঠা করা হবে হুগলীর বাঁশবেড়িয়া গ্রামে। ৩০শে এপ্রিল ১৮৪৩ সনে, রবিবার এই পাঠশালা নতুন করে প্রতিষ্ঠা পেল। মোটাদাগের বেতন সত্ত্বেও সেখানে গিয়ে অক্ষয়কুমার শিক্ষকতা করতে সম্মত হলেন না। কিন্তু সেখানে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার দিন অনেকের সঙ্গে তিনি উপস্থিত থাকলেন এবং বিরাট জনসমাগমে বক্তৃতা করলেন। তখন তাঁর বয়স তেইশ বছর। আমাদের সৌভাগ্য যে, 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামে তাঁর সেই বক্তৃতা *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* (দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৭৬৫ শকাব্দ) মুদ্রিত হয়। 'সৌভাগ্য' বলা হচ্ছে এই জন্যে যে, এই বক্তৃতা কোন কারণে পত্রিকায় মুদ্রিত না হলে, হয়তো হারিয়ে যেত বাঙালির এক অবিস্মরণীয় চেতনা-স্তরের ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন,

> আমরা আর কোন বিষয়ে আপনাদিগের প্রতি নির্ভর করতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এক্ষণে আমাদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এ দেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না–তাঁহাদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবে এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হইবে।[১২]

উদ্ধৃত এই বক্তব্যে পাওয়া যায়, স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও জাতিপ্রতিষ্ঠার মতো অমূল্য দুই আকাঙ্ক্ষার কথা। চৌত্রিশ বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ সনে, উল্লিখিত বক্তব্যের তিরিশ বছর পরে বলেন, আমাদের মনে এই 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা'র চিন্তা ছিল না।[১৩] তাঁর মতে, এটা আমাদের ইংরেজদের সান্নিধ্যের ফল। অক্ষয়কুমার যখন ও কথা বলেন, তখন ছিল ইংরেজ বেনিয়া অর্থাৎ কোম্পানির শাসন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন এ কথা বলেন, তখন কোম্পানির হাত থেকে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরাসরি ইংরেজ সরকারের হাতে। ফলে এই দুই শাসনের মধ্যে শোষণে, নির্যাতনে ও সামাজিক শৃঙ্খলায় মৌল পার্থক্য যে ঘটে গেছে, তা স্মরণে রাখা ভালো। বলাবাহুল্য, অক্ষয়কুমার দত্তের মনীষা থেকে বাংলা ভাষায় আমরা প্রথম এই দুই চেতনার অনুপ্রেরণা লাভ করি। জাতীয়তাবোধ থেকে তৈরি হয় জাতিপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। আর সেকালে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হয় আমাদের চেতনা স্তরের সেই অনুভূতি থেকে যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'স্বদেশপ্রেম'। অক্ষয়কুমার দত্তের এই স্বদেশ যে ভারতবর্ষ, এটা নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। 'স্বদেশপ্রেম' শব্দ অক্ষয়কুমার নিজেও ব্যবহার করেছেন অসংখ্য প্রসঙ্গে, একাধিক রচনায়। ১৮৪৪ সনেই তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন 'স্বদেশপ্রীতি' নামে।[১৪] আর এই বক্তব্যে তিনি আত্মপরিচয়কে বিলীন করে না দেবার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উল্লিখিত বক্তৃতায়। বিখ্যাত রামমোহন-গবেষক দিলীপকুমার বিশ্বাস 'সাহিত্যে স্বদেশচিন্তা : রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে খুব পরিচ্ছন্ন ভাষায় লিখেছেন যে, 'রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর অবধি সকল লোকোত্তর পুরুষই ভারতে নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদস্বরূপ গণ্য করেছিলেন।'[১৫] অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তব্যে যে কণ্ঠস্বরের সাক্ষাৎ মেলে তা সম্ভবত ব্যতিক্রম। এমন স্বরের দেখা মেলে না সেকালের অন্য 'লোকোত্তর পুরুষ'দের কথায় ও আচরণে। জিজ্ঞাসা হচ্ছে, অক্ষয়কুমার 'এদেশের জাতীয় ধর্ম' বলতে কী বুঝিয়েছেন? 'জাতীয় ভাষা' কিংবা 'এদেশের যথার্থ ধর্ম' কী? তিনি ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের জাতীয় প্রভেদের কথা বলেছেন। ভারতীয় জাতিসত্তার ভাবনাই তখন তাঁর মনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। কেননা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বে ইংরেজ আর ভারতীয় সত্তার স্বাতন্ত্র্য কল্পনাই তখন তাঁর পক্ষে ছিল স্বাভাবিক ও সঙ্গত। এটা ছিল তখন আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন। এই স্বাতন্ত্র্য

আমাদের রক্ষা করতে হবে ভাষায়, শিক্ষায়, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এবং জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চায়। এ সবই আমাদের আত্মপরিচয়ের একেকটি মাত্রা। এটাই যথার্থ ধর্ম।

দেখা যাচ্ছে, মাত্র কুড়ি-একুশ বছর বয়সে অক্ষয়কুমার লিখেছিলেন শুদ্ধ বিজ্ঞানের বই। কিন্তু সেটা ইংরেজিতে নয়, বাংলায়। কেন? তিনি বাঙালি ছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা বাংলা ছিল। তিনি মাকে ভালোবাসতেন। মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা স্বর্গের চেয়ে দামি, এই কথা তিনি বলেছিলেন ১৮৪৮ সনে লেখা 'ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলন' প্রবন্ধে।[১৬] এই কথা বলে স্বর্গ থেকে তিনি আমাদের বাস্তব জগতের মধ্যে নিয়ে এলেন। যা ছিল এতদিন কল্পনায়, তিনি বললেন, আমাদের এ জগৎটাকে স্বর্গ বানাতে হবে। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে এই ভাব আমাদের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একেবারে নতুন। এটা অক্ষয়কুমার বিশ্বাস করতেন। ভালোবাসতেন তিনি এই ভাবকে। যাকে ভালোবাসি, তার উন্নতির জন্যে সপ্রাণ চেষ্টা করবার নাম মনুষ্যত্ব। ধ্রুবস্থির নক্ষত্রের মতো ছিল তাঁর এই বিশ্বাস। তাই তিনি আটাশ বছর বয়সে লিখেছেন,

> জন্মভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্বচনীয় স্নেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়– প্রেমামৃত রস সাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়। যে স্থানে আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্যক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগী মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমাদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুহৃদ্ মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ, সম্পদ, যাহা কিছু সকলই আমাদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাবসিদ্ধ নহে? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ যে তাহার নদী, পর্বত, মৃত্তিকা পর্যন্ত আমাদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে আর নাই—যে নাম চিন্তা মাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ্ বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রত হইয়া উঠে! [...] এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য?[১৭]

অক্ষয়কুমার মনে করতেন, জীবনের সবচেয়ে বড় দায় ভালোবাসার দায়। সে ভালোবাসা নর-নারীর মধ্যে হোক, কিংবা হোক আর কোনো সত্য। আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে যার যোগাত্মক ভূমিকা আছে, তার প্রতি টান তো স্বাভাবিক এবং সহজাত। কিন্তু যাকে ভালোবাসি, যে বস্তুকে ভালোবাসি, মানুষে পুরো আয়ুর শক্তি দিয়ে তাকেই রক্ষা করতে চায়। তার উন্নতি করতে চায় জীবনশক্তির সবটুকু কর্মতৎপরতা দিয়ে। এজন্যে ভালোবাসা তাকেই বলা হয়েছে সজ্ঞান প্রয়াস যেখানে অনিঃশেষ। নিঃশ্চেষ্টতার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব ও কর্মের নাম ভালোবাসা। এই ভালোবাসা হিংসামুক্ত। কোনো কামনার

মোহে হিংসার উদ্রেক যেখানে হয়, ভালোবাসা সেখানে নেই। এমন ভালোবাসার মধ্যে দুঃখ অনিঃশেষ। এটা জেনে যার মধ্যে ভালোবাসা স্থির করা যায়, তাতে আনন্দ আছে। সুখ আছে, আছে স্বস্তি। এই সত্যের মধ্যে জীবনের সার্থকতা।

অক্ষয়কুমার বেশ কিছু ভাষা জানতেন। বাংলা-সংস্কৃত ছিল তো তাঁর মাতৃভাষা। এছাড়া ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, গ্রিক, ল্যাটিন, আরবি, ফারসি, পালি, প্রাকৃত ভাষাও তাঁর জানা ছিল।[১৮] এইসব ভাষা জানাটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও অক্ষয়কুমার কিন্তু একটা ফুটনোটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমাদের। তিনি সেখানে বলেন,

> অনেকে ভাষা শিক্ষাকেই প্রকৃত বিদ্যা-শিক্ষা বোধ করেন, এবং যে ব্যক্তি আপনাকে যত প্রকার ভাষায় ব্যুৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহার তত পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। [...] বস্তুত ভাষা শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান-শিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা, জ্ঞান রূপ ভাণ্ডারের দ্বার স্বরূপ; সেই দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হয়। চির জীবনই কেবল দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান থাকিলে, কি রূপে জ্ঞান রূপ মহারত্ন লাভের সম্ভাবনা থাকে? [...] যে ব্যক্তি কেবল ব্যাকরণ-শাস্ত্র মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, জ্ঞান লাভ বিষয়ে নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ বিভিন্নতা নাই।[১৯]

ভাষা শিখতে হবে। কেননা এ শিক্ষা অপরিহার্য। তবে ভাষা জানাটাই ভাষা শেখার সার্থকতা নয়। ভাষা জানার ব্যাপারে অক্ষয়কুমার দুটো লক্ষ্য মনে রাখতে বলেন। ১. জ্ঞান আহরণ, ২. মাতৃভাষা সমৃদ্ধকরণ। তাঁর কাছে এই মৌল লক্ষ্য কোনো শখের বিষয় ছিল না। তিনি জানতেন, মানুষে যা শখের বশে করে, তার শতভাগ হয় অবসর বিনোদন, নয় বিশুদ্ধ আমোদ। আর এই অবসর বিনোদন ও বিশুদ্ধ আমোদ থেকে যা সৃষ্টি হয়, তা না হয় কাব্য, না হয় দর্শন, না হয় বিজ্ঞান। পৃথিবীতে মানুষে যেটাকে জ্ঞান বলে জানে, সেটা জীবনের কেন্দ্রীয় বিষয়। এটাকে উপেক্ষা করলে জ্ঞানও হয় না, কর্মও হয় না। সেজন্য অক্ষয়কুমার বলেন,

> বর্তমানকালে ইউরোপ খণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষা সকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যক রূপে উপার্জিত হইবার নহে; আমাদিগের মূল ভাষা সংস্কৃত এদেশীয় সকল শাস্ত্র ও সকলবিদ্যার আধার ও বর্তমান দেশ ভাষা সকলেরও আকর স্বরূপ হইয়াছে; এবং আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র, অতএব দেশ ভাষার পাঠশালা ব্যতীত স্থান বিশেষে এমত মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থীরা ইংরাজি, ফ্রেনস ও জর্মান এবং সংস্কৃত, আরবী ও পারসীক ভাষা সুন্দর রূপে অভ্যাস করিতে পারে।[২০]

উনিশ শতকের মধ্যপর্বে দেখা যায়, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 'এ দেশে এক নবসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়, যে সম্প্রদায় বাংলা কথা ভুলেও মুখে আনতেন না, এমন-কি, ঘরেও না। সেই ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়ের লোকেরাও আজ বাংলা বলেন, বাংলা লেখেন, এমনকি, প্রকাশ্য সভাসমিতিতে খাঁটি বাংলায় বক্তৃতা পর্যন্ত করতে পিছপাও হন না।'[২১] অবহেলা আর অবজ্ঞা থেকে মাতৃভাষার প্রতি এই যে সক্রিয় উৎসাহ, এ ব্যাপারে অক্ষয়কুমার দত্তের দুয়েকটি দুর্দান্ত ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করা দরকার। কেননা এই বাস্তববাদী মানুষটি আমাদের হাতে ধরে কোন্ অন্ধকার থেকে কোন্ আলোর মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছিলেন, সেই ইতিহাসটা আমরা অনেকেই জানি না! ঐতিহাসিক সাক্ষ্য থেকে এর প্রমাণ নেওয়া যাক।

৩

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ* (১৯০৪) বইতে বলেন যে, সেকালে *রসরাজ*, *যেমন কর্ম তেমন ফল* প্রভৃতি পত্রিকা তো দূরের কথা *সংবাদ প্রভাকর*, *ভাস্কর* প্রভৃতি পত্রেও এমন সব বিষয় মুদ্রিত হত যার দরুন ডিরোজিওর শিষ্যরা ঘৃণায় সে সব পত্রিকা স্পর্শও করতেন না। এই সময় *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* প্রকাশিত হয়। এতে ধর্মানুভূতিময় লেখা মুদ্রিত হলেও আধুনিক শিক্ষা-উপযোগী ও সমাজ সংস্কারমূলক এমন সব উৎকৃষ্ট মানের লেখা ছাপা হয়, যাতে এই সম্প্রদায়ের লোকের দৃষ্টি মূলগতভাবে পালটে যায়! শিবনাথ শাস্ত্রী এ প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন– "রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষার গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ", বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।[২২]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গম্ভীর ভাবের সঙ্গে ভাষার সৌন্দর্য যে 'ইঙ্গবঙ্গসম্প্রদায়ের' লোককে মুগ্ধ করেছিল, তা নিঃসন্দেহ। এই দুই গুণে তখন পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা আটশতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এর কৃতিত্ব স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) সম্পাদককে দিয়েছিলেন।[২৩] বাংলা ভাষার দিকে ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি ফেরাবার কাজ এই প্রথম শুরু হয়। এবার দ্বিতীয় ঘটনাটির কথা উল্লেখযোগ্য।

ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২)-এর মৃত্যু পর, প্রথম দুবছর তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্মরণসভায় যে বক্তৃতা হয়, তা ছিল ইংরেজি ভাষায়। ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তখন সেটাই ছিল সভ্যরীতি। তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৪৫ সনে বক্তৃতা

করবার জন্যে আমন্ত্রণ করা হয় অক্ষয়কুমার দত্তকে। তিনি প্রথম এই রীতি ভেঙে দিলেন বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'ডেভিড হেয়ার সাহেবের নামস্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা'। অক্ষয়কুমার বক্তৃতার বিষয় ঠিক করেছিলেন ডেভিড হেয়ারের শিক্ষার আদর্শ। বক্তৃতার স্থান নির্ধারিত হয়েছিল তৎকালীন কলকাতার 'ফৌজদারী বালাখানা হল'। অনুষ্ঠানে সেকালের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গে হল ভর্তি ছিল। রামগোপাল ঘোষ এই সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি সভাপতির ভাষণে অক্ষয়কুমার দত্তের বাংলায় করা বক্তৃতার এক কথায় ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং উপস্থিত বিদ্বজ্জনের মনকে যে সে বক্তৃতা দারুণভাবে উজ্জীবিত করে তোলে, তা উল্লেখ করে রামগোপাল ঘোষ বলেন,

> Babu Akshaykumar Datta then rose to deliver a discourse, which was in Bengali language. The subject of it was the changes effected by the agency of Education in the Hindu mind. He began by taking a retrospective view of the condition of this country. He contrasted the present with the past. Time was, said he, when Hindus were so utterly incapable of appreciating the utility of public works that they would not have subscribed a pice to promote them—when they understood nothing except what related to the gratification of their animal wants. [...] The Babu (Babu Akshaykumar Datta) sat down amidst loud and enthusiastic cheers.[২৪]

মানুষের মনকে কার্যকরভাবে পরিবর্তিত ও বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা হচ্ছে সর্বোত্তম সহায়ক শক্তি। এদেশের পক্ষে সেই গুরুতর কাজটি করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এই সভায় আলোচকদের মধ্যে একজন বক্তা ছিলেন *ইন্ডিয়ান ফিল্ড* পত্রিকার সম্পাদক, ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১) অন্যতম শিষ্য এবং প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)-এর ছোটো ভাই কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩)। অক্ষয়কুমারের বক্তৃতা শুনে তিনি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর আলোচনায় বলেন,

> The Discourse we have just heard is very clever and interesting, and it is not the less so, because of its being a *Bengali one*. I know [...] that there is a large number of our educated friends who can relish nothing that is Bengali, their taste being diametrically opposed to all that is written in their own tongue. The most elevated thoughts and the most sublime sentiments, when

> embodied in it, become flat, stale and unprofitable. But this prejudice is, I am disposed to think, fast wearing out, and the necessity and importance of cultivating the Bengali Language – the language of our country, the language of our infancy, the language in which our earliest ideas and associations are entwined – will ere long be recognised by all.[২৫]

১৮৪৫ সনের ১ জুন, রবিবার সন্ধ্যায় করা অক্ষয়কুমার দত্তের এই বক্তৃতার মৌল অভিপ্রায়টি কিশোরীচাঁদ মিত্র খুব ভালোভাবে ধরতে পেরেছিলেন। জাতীয় জীবনের সমস্ত চিন্তা ও কর্মের মধ্যে মাতৃভাষা এক ও অদ্বিতীয় শক্তি। বক্তৃতায় অক্ষয়কুমার সেই শক্তি কিভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, বক্তৃতা থেকে তার একটা নজির পেশ করা যাক। ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে অক্ষয়কুমারের মূল কথাটায় বলেন,

> তিনি আমাদিগকে হীরক দেন নই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ-কোটিগুণ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা দ্বারা আমরা জ্ঞানের আস্বাদ-প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দয়া ও সত্য ব্যবহার যে কি মহোপকারী, তাহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। পীড়িতের রোগ শান্তি, বিদপগ্রস্তের দুঃখ মোচন, অবিজ্ঞকে পরামর্শ দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি হিতকার্য তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল।[২৬]

আজ থেকে একশো পঁচাত্তর বছর আগে দেওয়া বক্তৃতার কথাগুলি যেন হীরের টুকরোর মতো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। অমলিন হয়ে আছে এর ভাব ও ভাষা। জীবন্ত হয়ে আছে এর মূল্যবোধ। ব্যক্তি মানুষের কীর্তির মূল্যায়ন যে এভাবে করা যায়, আমাদের ভাষায় এর পূর্ব কোনো দৃষ্টান্ত ছিল না। সর্বোপরি, সহসা মনে করা কঠিন যে, এই ভাষা ও এই মূল্যবোধ এত পুরাতন! সহসা মনে করা শক্ত যে, বাংলা ভাষার মধ্যে এত শক্তি অব্যক্ত হয়ে ছিল! তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অক্ষয়কুমার যে অপূর্ব মানসিক শক্তিবলে বাংলা ভাষার প্রতি ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী করে তুলেছিলেন, এটা তাঁর প্রতিভার একটা অসামান্য দিক। তখনকার শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি অত্যন্ত কার্যকরভাবে অনুভবে করাতে পেরেছিলেন যে, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মত দামি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)-এর জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-১৯২৭) উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন,

> ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতির কার্য্য ইংরেজীতে নিষ্পন্ন হওয়া যেন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পূর্ব্বে অনেকের ধারণা ছিল; বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত সে সংস্কারেরও উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। ডেভিড হেয়ারের স্মরণার্থ সভা ইংরেজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই উদযোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার তৃতীয় সাম্বৎসরিক

> উৎসব উপলক্ষ্যে অক্ষয় বাবু বাঙ্গালা ভাষাতে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের সভায়, বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে কখনও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা হয় নাই। অক্ষয় বাবুর বক্তৃতা হইতে, যেন এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। যে সকল ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি, এতদিন, বাঙ্গালা ভাষাকে 'বর্ব্বরের ভাষা' বলিয়া মনে করিতেন, এবং যাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালা ভাষা, শিশুর ও মূর্খের হৃদয়ের ভাব বিকাশের উপযোগী হইলেও, সুশিক্ষিতের চিন্তা প্রকাশের উপযোগী নয়; অক্ষয় বাবুর তেজস্বিনী ভাষা হইতে তাঁহারা আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।[২৭]

অক্ষয়কুমার দত্তের অন্যতম জীবনীকার রাজকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) বলেন,

> ইংরেজী শিক্ষিতগণ ইংরেজী রচনায় মন দিলেন, বাঙ্গালার প্রতি তেমনি অমনোযোগী হইলেন। বাঙ্গালা আলোচনায় একেতো অর্থোপার্জ্জনের কোন সুবিধা নাই তার উপর আবার সেই সময়ের পত্রপত্রিকার বাঙ্গালাও ভাল ছিল না – সে বাঙ্গালা পড়িয়া ইংরেজী রসভোগী শিক্ষিতেরা মোটেই আনন্দ পাইত না। কিন্তু অক্ষয়কুমারের লেখা লইয়া যখন তত্ত্ববোধিনী বাহির হইল, তখন তাহা পাঠ করিয়া ইংরেজী শিক্ষিতগণও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্রমে বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষার সেবায় অগ্রসর হইলেন। বাঙ্গালা ভাষার ক্ষুদ্র গোষ্পদ দেখিতে দেখিতে বিশাল সাগরে পরিণত হইল। প্রকৃত পক্ষে অক্ষয়কুমারের লেখনীই ইহার মূল।[২৮]

যোগীন্দ্রনাথ বসু যে উল্লেখ করেছেন, 'বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত যে সুবীজ বপন করিয়াছিলেন, মাতৃভাষাবৎসল অন্যান্য ব্যক্তির যত্নে তাহা, এইরূপে অঙ্কুরিত হইয়া, দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল'[২৯] – তাঁর কথাটি যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ এই যে, অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতার পরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫)-এর মতো ইংরেজি নবিশ লিখেছিলেন, 'কি উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইতে পারে', কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) লিখেছিলেন 'বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন'।[৩০] এখানেই শেষ নয়, হেয়ার স্মরণসভার কমিটি ঘোষণা করেন যে, বাংলা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট লেখার জন্যে একটি পুরস্কার প্রদান করা হবে। বলাবাহুল্য, এ ঘোষণায় ফল ফলেছিল। বাণভট্ট রচিত সংস্কৃত গদ্যকাব্য *কাদম্বরী*র অনুবাদক তারাশঙ্কর শর্মা (১৮৫৮) এবং *পদ্মিনী উপাখ্যান* (১৮৫৮)-এর লেখক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭) যথাক্রমে 'হিন্দু রমণীদিগের শিক্ষা'[৩১] ও 'ব্যায়াম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা'[৩২] লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন।[৩৩]

এইসব পরিবর্তনকে যুগান্তকারী ঘটনা বলে না জানাটা হচ্ছে পাপের সমতুল্য। একজন মানুষ জাতীয় সংস্কৃতিকে মোচড় দিয়ে পুরাতন ধারার থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছেন, এটাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলে স্বীকার না করা ঐতিহাসিক সত্যের পরিচয় নয়! কেননা উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের এইসব ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে এবং প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাংলা ভাষার সপক্ষে অক্ষয়কুমার দত্তের লড়াই থেকে সমকালীন কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গ বিপুলভাবে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং উদ্দীপ্ত কর্মপ্রেরণায় বাংলা ভাষার উন্নতির জন্যে নতুনভাবে নানা উদ্‌যোগ গ্রহণ করেন।

৪

অক্ষয়কুমার আমাদের প্রথম শেখান যে, জাতীয় জীবন গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় 'স্বজাতীয় ভাষার অনুশীলন'। এর মধ্যদিয়ে যা গড়ে উঠবে তাতে থাকবে জাতীয় মনের স্বরূপ ও জাতীয় কৃতিত্বের পরিচয়। এজন্যে দেখা যায়, অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষার পক্ষে তাঁর লড়াইটা কেবল ইংরেজি শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বক্তৃতা করেই শেষ করেননি। তিনি প্রথমে বাংলা ভাষার শত্রুদের চিহ্নিত করেছিলেন। পরে এর প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করেন। কারা ছিলেন এই শত্রু? *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* (১৮৪৩) 'ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলন' প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার লিখেছেন, 'কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলন্ডীয় ভাষায় নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে, ও তাহার সুনিপুণ শিক্ষক সকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশীয় লোককে বাঙ্গলার পরিবর্তে ইংলন্ডীয় ভাষার উপদেশ করা উচিত।'[৩৪] এঁরা কারা? ১৮৩৫ সনে প্রবর্তিত অফিসিয়াল ভাষা ইংরেজি করবার ফলে যাঁরা স্বজাতীয় ভাষা উপেক্ষা করে এই অফিসিয়াল ভাষাকে জীবনের একমাত্র নিদান বলে ধরে নিয়েছিলেন, এঁরা সেই শ্রেণী। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিহ্নিত করে দেখান, এঁরাই ছিলেন বাংলা ভাষার শত্রু। তিনি এই বিরোধী মনোভাবকে পুরোপুরি খারিজ করে দিয়ে বলেন,

> স্বদেশের বিদ্যা যতকাল স্বদেশের ভাষা স্বরূপ সুচারু পরিচ্ছদ পরিধানে সজ্জীভূত না হয়, ততকাল সর্বসাধারণের হৃদয়গত কখনই হইতে পারে না। [...] স্বদেশোৎপন্ন শস্য যেরূপে সকলের সুলভ হইয়া সর্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ স্বদেশের ভাষা দ্বারা সকলে জ্ঞান তৃপ্ত হইয়া তৎফল সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।[৩৫]

এই অনুভব অক্ষয়কুমারকে প্রবৃত্ত করেছিল *ভূগোল*, *পদার্থবিদ্যা*, *চারুপাঠ* প্রভৃতি বই লেখায়। কেননা এটাই ছিল তখনকার জন্যে ফলপ্রসূ ও কার্যকর পদক্ষেপ। উনিশ শতকে এইসব বই বাঙালি ছেলেদের মানসিক শিক্ষার পাটাতন নির্মাণে বিপুলভাবে সহায়ক হয়। একই সঙ্গে মাতৃভাষা বাংলার সঙ্গে অন্তরের যোগ ঘনিষ্ঠ হয়। অক্ষয়কুমার

মনে করতেন, 'শিশুর রসনা মাতৃদুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্বকালেই যে ভাষার অর্ধভাগ তাহার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ়কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়',[৩৬] সেই ভাষায় শিক্ষা অর্জন করা দরকার। কারণ, 'স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন দেশের আপামর সাধারণ সকল লোকের বিদ্যোপার্জন হওয়া সম্ভাবিত নহে।'[৩৭] তিনি আরও বলেন, 'স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন দেশে জ্ঞানের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না।'[৩৮] তাঁর অখণ্ডনীয় যৌক্তিক বাক্য এই যে, 'পরদেশীয় ভাষামাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় হয়, সে কাল মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে।' কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এ বাক্য বোঝা কঠিন নয়। তবে এখানেও একটা কথা আছে। অক্ষয়কুমার মনে করেন, 'যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা, সুতরাং জ্ঞানার্জনের যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে', তারা বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে পারে। কিন্তু তৎকালীন বাস্তবতায় তিনি জোর দিয়েছিলেন,

> দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নভাবে শীর্ণ, বা যে সকল মধ্যবর্তী গৃহস্থ বালকেরা দুরবস্থা হইয়া ক্ষুণ্নভাবে কাল যাপন করে, যাহাদিগের পিতা মাতা কেবল আপন পুত্রদিগের ভাবী উপার্জনের প্রত্যাশায় প্রাণ ধারণ করেন, সে সকল বালকের পরের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যালাভের সময় নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জন করিবার উপায়ও নাই। সকল দেশেরই এই প্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংলণ্ড দেশে উপায়ক্ষম ব্যক্তিদিগের নানা ভাষা শিক্ষার জন্য নগর বিশেষে যেরূপ মহা মহা বিদ্যাগার বর্তমান আছে, তদ্রূপ সর্বসাধারণের বিদ্যাভ্যাস নিমিত্তে গ্রাম মধ্যে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপিত আছে। এদেশের বিষয়ও রাজ পুরুষদিগের সেই নিয়মের অনুবর্তী হওয়া আবশ্যক।'[৩৯]

সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা থেকে নিয়ে উচ্চায়ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মতোই জীবনদায়ী, এই মতই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন,

> যে স্থানের নদী পর্বত মৃত্তিকা পর্যন্ত আমাদিগের প্রীতি পাত্র, সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশব কালের অর্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য প্রকাশ করে।[৪০]

উল্লেখ্য যে, রামমোহন রায় এদেশে উচ্চশিক্ষার জন্যে ইংরেজি ভাষার কথা বলেছিলেন। বাস্তবতার কথা ভেবেই হয়ত তিনি এই মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। অক্ষয়কুমার বলেছিলেন মাতৃভাষা বাংলার কথা। তিনি অবস্থার বশীভূত হতে চাননি, অবস্থাকে বশীভূত করতে চেয়েছিলেন। এটা তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদী আবেগ ছিল না।

তিনি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবার কথা বলেছিলেন। তিনি এক্ষেত্রে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন, তা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন,

> দেখ ভারতবর্ষের সমীপবর্তী পারসীক দেশে যে পর্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্টরূপে প্রচার ছিল, সে পর্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকবি ফেরদৌসী আত্ম ভাষাতে *শাহনামা* গ্রন্থ রচনা করিলে কত কাব্যামৃত রসপূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সঙ্গীত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ও সে সকল দেশে আপনাদিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাঁহাদিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোন ব্যক্তি যশস্বী গ্রন্থকর্তা রূপে বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বর্জিল ও হোরেস, এবং লিবি ও সিসিরো–ইঁহারা সকলেই ইটালী ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্মেনি দেশেতে কীর্তিমান ফ্রেডরিক রাজার রাজত্বকালে পর্যন্ত ফ্রেন্স ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি স্বকৃত ললিত কবিতা দ্বারা আপনার দেশ ভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থকর্তা আপনাদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্যোদ্ভব রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলন্ড দেশে যতদিন নর্মান ফ্রেন্স নামক ভাষার আলোচনা ছিল, ততদিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই, পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার কবিতা সকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্যত দেখ ইউরোপ খণ্ডে যে পর্যন্ত লাটিন ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্তি হয় নাই, ও উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎখণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধ কাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন, পোর্টগেল, ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা যখন স্ব স্ব দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপ খণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল।[৪১]

এ ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের সামনে আমাদের কর্তব্য কী? অক্ষয়কুমার বলেন, 'আমাদিগের উচিত যে সর্বস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি, বেকন্ ও লাক্, নিউটন্ ও লাপ্লাস্, কুবিয়ার্ ও হম্বোল্ট প্রভৃতি সর্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্ম ভাষাতে ভাষিত করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যা সকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়।'[৪২] লোকের কাছে যা জ্ঞান বলে মান্য, পৃথিবীর সমস্ত

মানুষের তা সাধারণ সম্পত্তি। এই জ্ঞান নিজের ভাষায় অঙ্গীকৃত করে নেবার উপায়ের নাম তরজমা। এটাকেই অক্ষয়কুমার বলেন 'আপন ভাষাতে সংগ্রহ' করা। কিন্তু এই 'অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যা' বলতে তিনি কী বুঝিয়ে ছিলেন? সাহিত্যের নানা প্রকরণ ছাড়াও বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি। সত্য যে, এ কাজ সহজ নয়। এজন্যে যা দরকার অক্ষয়কুমার সে সম্পর্কে বলেন,

> গুরু কার্যের গুরু উপায় আবশ্যক; উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য সে কার্য সিদ্ধি হইবে! ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা এবং দেশ ভাষার উপযুক্ত শিক্ষক সকল প্রস্তুত করা এ বিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন, এবং সম্যক যত্নপূর্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন, তখন তাঁহারা দিন দিন কৃতকার্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবে, এবং দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিবাদ আছে, তখন তাহা কার্য দ্বারা খণ্ডন হইয়া চতুর্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবে।'[৪৩]

বাংলা ভাষা সম্পর্কে অক্ষয়কুমার একটা মহাপরিকল্পনার কথা ভেবেছিলেন। সম্ভবত প্রত্যেক ভাষার পক্ষেই তার প্রাথমিক স্তরের পরিকল্পনা এমন সুদূরবিস্তারী না হলে ভালো ফল কিছু ফলে না। অক্ষয়কুমার এমন আশা মনে পোষণ করেন যে, আজ আমরা ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের যা কিছু জ্ঞানের বিষয় তা যদি তরজমায় আত্মসাৎ করতে পারি, একদিন তাই হয়ে উঠবে নতুন জ্ঞানবিদ্যার আধার। তখন,

> এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা যদি আত্ম ভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি এবং তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ হয়, তবে আমাদিগের অতি অনুপম আত্ম সন্তোষ লব্ধ হইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্ত বেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমাদিগকেও গণ্য করিবেন, এবং পরজাতীয় লোকেরা আমাদিগের সুচারু রচিত প্রস্তাব সকল পাঠের নিমিত্তে আমাদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন। আমাদিগের দেশ ভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক সম্ভব, কারণ তাহার বর্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।[৪৪]

অক্ষয়কুমার আমাদের যা বলতে চেয়েছিলেন তার সারকথা এই যে, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, 'বিদ্যা যশ লক্ষ্মী রূপ জয়—এ-সকলই আত্মবলে অর্জন করতে হয়, প্রার্থনাবলে নয়।'[৪৫] রেনেসাঁস জোর দিয়েছিল আত্মার চাইতে বুদ্ধির ওপর, অন্তরের চাইতে বাহ্যবস্তুর ওপর, প্রার্থনার চাইতে কর্মশক্তির ওপর। এক কথায় অন্তর-ইন্দ্রিয়ের কল্পিত স্বর্গের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সুখ ও স্বস্তির জন্যে জ্ঞানের সৌন্দর্যকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা ছিল রেনেসাঁসের আদর্শ। সমস্ত অন্তর দিয়ে অক্ষয়কুমার এই আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি

প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'জ্ঞান অনুসারে যদি কার্যই না হইল, তবে সে জ্ঞানে ফল কি?'[৪৬] এই জিজ্ঞাসা ছিল তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তি। তাই শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ার পরেও তিনি দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছিলেন,

> কোথায় বা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান-বিশেষের বিশেষরূপ অনুশীলনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান-চেষ্টা, কোথায় বা ভূমণ্ডল অথবা তদীয় ভূরি-ভাগ-সন্দর্শন-বাসনায় এক এক বারে বহুবিধ বর্ব্বর-নিবাস, সুপ্রাচীন মানব-কীর্ত্তি এবং অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সামগ্রী ও অদ্ভূত নৈসর্গিক ব্যাপারাদি-বিশিষ্ট বিস্তৃত ভূখণ্ড-পরিভ্রমণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকৃতির যুগপৎ সমন্নতি সাধন-ব্রতে ব্রতী স্বদেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষ-প্রবর্ত্তনের অভিপ্রায় এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন ও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ-প্রণয়ন ও স্বদেশ-সম্বন্ধীয় নানা প্রকার হিতানুষ্ঠান-কামনা রহিল! সকলই বাষ্পীভূত হইয়া গেল! সকল বাসনাই নির্মূল হইল! অঙ্কুরেই আঘাত ঘটিল! আমার হৃদয়স্থ পুষ্পোদ্যানটি এক বারেই শুষ্ক হইয়া গেল![৪৭]

তিনি আরও বলেন, 'ভূতত্ত্ব বা উদ্ভিদ-বিদ্যা অবলম্বন করিবার অভিলাষ ছিল। তাহার সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম মাত্র। এক বারেই অপরাপর সকল বাসনার সহিত সে বাসনাও নির্মূল হইয়া গেল।'[৪৮] অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান-অন্তপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, 'আমি চিরজীবন বিজ্ঞান-বিশেষের অনুশীলনে অনুরক্ত থাকিয়া তৎসংক্রান্ত নানা বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করিব এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। যে বিদ্যার অনুশীলনে অনুরক্ত হই না কেন, তদর্থ ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মেন্, এই তিন ভাষাই শিক্ষা করা আবশ্যক। আমি যে ভয়ানক শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা আমার অন্য অন্য সকল বাসনার সহিত এ বাসনাও উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে।'[৪৯] এখানেই শেষ নয়। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে তাঁর চিন্তা যে কত বিচিত্র পথধরে হাঁটছিল, তা ভাবতে গেলে কেবলি বিস্মিত হতে হয়। চিন্তাটা ছিল তাঁর কাছে অনিঃশেষ পথ চলার এক পরমপ্রিয় বন্ধু! যে থামতে জানে না কোথাও! রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এক চিঠিতে অক্ষয়কুমার বলেন যে,

> পদার্থবিদ্যা সমাপ্ত হইলে আপনকার অভিপ্রায়ানুসারে যন্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিবার মানস থাকিল। কিন্তু ভাই, একে নূতন ভাষায় নূতন শব্দ সঞ্চলন করিয়া লিখিতে হয়, তাহাতে, বিদ্যা সাধ্য যত তাহা আপনার অবিদিত নাই; আবার এ দেশের যে প্রকার স্বভাব এবং আমাদের যেরূপ বলবীর্য্যহীন প্রকৃতি, তাহাতে এ সকল বিষয়ে কোন মতেই সাহস করা যায় না। সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, মনোমত কোন কার্য্য হইয়া উঠিল না।[৫০]

কী উপায় অবলম্বন করলে 'পরজাতীয় লোকেরা আমাদিগের সুচারু রচিত প্রস্তাব সকল পাঠের নিমিত্তে আমাদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন', তার দিকনির্দেশনা

অক্ষয়কুমার অত্যন্ত কার্যকরভাবে অনুপুঙ্খ উল্লেখ করেছেন। অক্ষয়কুমার নিজে এই তত্ত্ব কী ভাবে ফলপ্রসূ করে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিলেন, এবার তার প্রমাণ দেওয়া যাক।

৫

বলাবাহুল্য, বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিকাশের জন্যে অক্ষয়কুমার যে পরিকল্পনা তাত্ত্বিকভাবে পরিবেশন করেছিলেন, সেটা একই সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও বেদনার প্রকাশ। এ ভাষা কী ভাবে সভ্য দুনিয়ার মধ্যে বড় হয়ে উঠবে, সেটাই ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়। তিনি দেখিয়েছেন 'সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, পুরাতত্ত্ব, বার্তাশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন' প্রভৃতির অনুশীলন ও চর্চার মধ্যদিয়েই কেবল কোনো ভাষা উন্নত ও বিকশিত হতে পারে। এই সবের চর্চা তো একক কোনো প্রতিভার ব্যাপার নয়। তিনি নিজে বাংলা ভাষার একটা দিকের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন–বাংলা গদ্যের দিকটাই ছিল যার সর্বপ্রধান রূপ। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি লিখেছিলেন *ভূগোল*, *পদার্থবিদ্যা*, *চারুপাঠ* প্রভৃতি বই। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* সম্পাদনাকালেই লিখেছিলেন, *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার* (প্রথম ভাগ ১৮৫১, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫২), *ধর্মনীতি* (১৮৫৬) নামের মূল্যবান গ্রন্থ। এ বইগুলির বিষয় একাধারে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, শিক্ষানীতি ও প্রযুক্তিবিদ্যা আলোচনার সমাহার। প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ববিদ্যাও এতে আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও লিখেছিলেন, *বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ* (১৮৫৫), *ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৫), *প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার* (১৯০১)। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের আলোচনায় অক্ষয়কুমার মানুষের কল্যাণের দিকটি সবচেয়ে বড় করে দেখেছিলেন। অর্থনীতির আলোচনাও তাঁর কাছে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। মর্মান্তিক অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি লিখেছিলেন *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* (প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩)। প্রথম তিনি এ বইতে বাঙালির সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গোড়াপত্তন করেছিলেন।[৫১] পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙালির ধর্মের ইতিহাসে এই আলোচনা একটা বড় পদক্ষেপ।[৫২] শুধু তাই নয়, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বস্তুবাদী দর্শন অক্ষয়কুমারকে অনুপ্রাণিত করেছিল বাঙালির মৌলিক ইতিহাসচর্চায়। এটা ছিল বাঙালি মনের ভারতীয় চিন্তার ক্রমবিকাশের প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতির অসামান্য নিদর্শন।[৫৩] ভারতীয় ইতিহাসে যুক্তিবাদী মননের ভূমিকা কী, এ গ্রন্থে আঁকা হয়েছে সেই এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। বলাবাহুল্য, এ এক ব্যতিক্রমী গবেষণা–যে সমাজে যুক্তিবাদের সাধারণ ভিত্তি এবং বুদ্ধির ভাষার ন্যূনতম মান্যতা ছিল না, সেই

সমাজে অক্ষয়কুমার ইতিহাস চেতনার নজির দেখিয়ে ছিলেন। ফলে এই গ্রন্থের মূল্য স্বীকৃত হয়নি সমকালে, স্বসমাজে ও স্বদেশীয় ভাষায়। এ গ্রন্থে অঙ্কিত ভাষার ভারী দিকটি কেবল পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে পড়েছে। এর গভীর ভাবুকতার স্বরূপটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসই শুধু নয়, বাংলা আধুনিক ভাষাতত্ত্বের চমৎকার তুলনামূলক আলোচনাও এখানে প্রথম পাওয়া যায়।[৫৪]

অক্ষয়কুমার যন্ত্রবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ববিদ্যা, পুরাবৃত্তবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বই লেখার সংকল্প করেছিলেন। শারীরিক অসুস্থতায় তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হতে পারেনি। তবে তিনি পুরো জীবনে যা কিছু লিখেছেন, তা বাংলা ভাষায়। তখনকার দিনে ইংরেজিতে লেখার গৌরব ছিল। বাংলায় লেখার কোনো মূল্য ছিল না। সেই অবস্থায় অক্ষয়কুমার কেবল নানা বিষয়ে বাংলা ভাষায় বই নয়, বৈচিত্র্যে-ভরা মৌলিক প্রবন্ধও লিখেছেন। তার সংখ্যা অর্ধশতকের অধিক। সে-সব প্রবন্ধ আজও অগ্রন্থিত রয়ে গেছে। এসবের উদ্দেশ্য কী ছিল? এ ভাষা যেন দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভাষার অন্যতম হয়ে উঠতে পারে। মোটকথা, বাংলা, বাঙালি আর বাংলাদেশ ছিল তাঁর অঙ্গীকার, কায়-মনোবাক্যে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছিলেন এর সবটুকু। দু'শো বছর পরে হলেও সেই কথাটি আজ আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য। তিনি বাংলা ভাষায় প্রকাশযোগ্য মানববিদ্যার কোনো-একটা ঘর খালি রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। আর সেজন্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে ইউরোপীয় জ্ঞানবিদ্যার মৌল ধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াস চালিয়েছিলেন জীবনব্যাপী। এ কথা মনে হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, উনিশ শতকে অক্ষয়কুমার দত্ত সেই ব্যক্তি যাঁর রচনায় পাশ্চাত্যের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নাম ও তাঁদের কীর্তির পরিচয় সাকার হয়ে উঠেছিল। জ্ঞানের চর্চা যে প্রার্থনাবলে নয়, 'আত্মবলে'ই করতে হয়, এই মহাসত্যটি অক্ষয়কুমার খুব কম বয়সে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে জেনেছিলেন এবং সেই দৃষ্টিই তিনি আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছিলেন।

বাংলা ভাষার মুক্তির পথ অক্ষয়কুমার যেভাবে দেখিয়েছিলেন, সেই পথে বাঙালির অনেক 'লোকোত্তর মনীষী'ই হেঁটেছেন, কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মাটি সেই হাঁটার পথে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারেনি। আমাদের ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়ে যাবে, বাংলাদেশ ভাষার জন্যে লড়াই করে তাজা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আবার এই ভাষাই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের বড় কারণ হয়েছে। স্বাধীনতার অনেক ফল আমরা ভোগ করছি, কিন্তু যথার্থ অর্থে আমাদের ভাষা আজও জ্ঞানের, বিদ্যার, গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি! কেন? অক্ষয়কুমার তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, 'বঙ্গদেশের রাজসভা সমূহে, সমস্ত বিচারালয়ে ও গভর্নমেন্ট সংক্রান্ত কার্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রচলন ও

বঙ্গদেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষারই শিক্ষা প্রদান এই নিয়ম প্রবর্তিত করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।'[৫৫] ভাষাকে রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মের মধ্যে ব্যবহার না করতে পারলে এবং বিচিত্র কর্মের মধ্যে ভাষার শক্তিকে পরীক্ষা না করতে পারলে, কোনো ভাষাই উন্নত ও বিকশিত হয় না। এজন্যে প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'ভাষার উৎপত্তি কর্মে আর তার পরিণতি জ্ঞানে।'[৫৬] কর্মে বৈচিত্র্য এলে ভাষার ভিতরের শব্দভাণ্ডার বেড়ে যায়। কেননা কর্মের প্রয়োজনে কথা তৈরি হয় আর তার মধ্যদিয়ে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়। এমনি করে ভাষার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়। এটাই কোনো সমৃদ্ধ ভাষার সাধারণ নিয়ম। এটাই একটি ঐশ্বর্যশালী ভাষার নিয়তি। বিদ্বৎসমাজে জ্ঞানের চর্চা অব্যাহত থাকলে ভাষার শক্তি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় উদ্‌যোগ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা ভাষার যথার্থ ব্যবহার সর্বত্রগামী করবার জন্যে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা অপরিহার্য। রাষ্ট্রের সুবুদ্ধি ভাষার ঐশ্বর্য বিস্তারে বিকল্পহীন। অক্ষয়কুমার এ ব্যাপারেও ভুল বলেননি। তাঁর মতে, 'রাজার এক আজ্ঞাতে যাহা হইবে, সহস্র সহস্র প্রজার যুগপৎ চেষ্টাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর।'[৫৭] রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মের মধ্যে ভাষার ব্যবহার 'রাজার এক আজ্ঞাতে' হওয়া সম্ভব নয়–এ কথা দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্রের সংবিধান লেখে না। ভাষার মুক্তির প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের দূরদৃষ্টি আজ এজন্যে গভীরভাবে অধ্যয়নযোগ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'বঙ্গভাষার উন্নতির প্রতিবন্ধক', *শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধাবলী* (সম্পাদক, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম), ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, মে ২০০৭, পৃ. ৯৩-৪

২. অক্ষয়কুমার দত্ত, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, (সম্পাদক, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম) ঢাকা, কথাপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৮৭

৩, *ঐ*, পৃ. ৮৫

৪. *ঐ*, পৃ. ৯৪

৫. *ঐ*, পৃ. ৯৫

৬. *ঐ*, পৃ. ৯৫

৭, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা', *বঙ্কিম-রচনাসংগ্রহ* (সম্পাদক, গোপাল হালদার), কলকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১০ই এপ্রিল ১৯৭৩, পৃ. ৩৫৮

৮. প্রমথ চৌধুরী, *প্রবন্ধসংগ্রহ*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ১৩৫

৯. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সংকলিত তথ্য, দ্র. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আত্মজীবনী*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬২, পৃ. ২৯৭

১০. *ঐ*, পৃ. ৪৪৭

১১. *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

১২. *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী*, পূর্বোক্ত। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার যে, অক্ষয়কুমার দত্তের এই সুবিখ্যাত বক্তৃতার বিষয় উল্লেখ করে অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, 'কি আশ্চর্য্য স্বদেশ-প্রেম! তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় পাতায় এই দেশানুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া আছে। দেশের শাস্ত্রোদ্ধার, তাহার ব্যাখ্যা, দেশের উপাসক-সম্প্রদায়ের সংবাদ, দেশের প্রাচীন সমাজব্যবস্থার আলোচনা ও প্রথা সকলের উৎপত্তি নির্ণয়, কুপ্রথা দূর করিবার জন্য উপদেশ–তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় এই শ্রেণীর রচনা প্রকাশিত হইত।' [দ্র. অজিতকুমার চক্রবর্তী, *মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর*, কলকাতা, এলাহাবাদ, ১৯১৬, পৃ ৮০]। অজিতকুমার চক্রবর্তী শুধু নন, আরো একাধিক বিখ্যাত গবেষক এই বক্তৃতার কথা তাঁদের লেখায় উদ্ধৃত করেছেন বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও স্বদেশ চেতনামূলক আদর্শের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে। [দ্র. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'বাংলাসাহিত্যে স্বদেশচেতনা' এবং দিলীপকুমার বিশ্বাস, 'সাহিত্যে স্বদেশচেতনা : রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর', *দেশ* সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭০]

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ভারত-কলঙ্ক', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৩

১৪. *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* গ্রন্থের 'স্বদেশপ্রেম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত

১৫. দিলীপকুমার বিশ্বাস, 'সাহিত্যে স্বদেশচেতনা : রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর' পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

১৬. *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩

১৭. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯

১৮. অক্ষয়কুমর দত্তের ভাষা জানার ব্যাপারে প্রাথমিক সূত্র হিসেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'সপ্তম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ' দেখে নেওয়া যেতে পারে। দ্র. *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাবলী*-২ (সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, সুমিত্রা ভট্টাচার্য সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১।

১৯. অক্ষয়কুমার দত্ত, *ধর্ম্মনীতি*, কলকাতা, শ্রীলালচাঁদ এণ্ড কোম্পানি, ১৭৭৭ শকাব্দ, পৃ. ১২১-১২২

২০. *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২

২১. প্রমথ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬

২২. *শিবনাথ রচনাসংগ্রহ*, কলকাতা, সাক্ষরতা প্রকাশন : পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ৫ই জুলাই ১৯৭৯, পৃ. ৩৬০

২৩. এই তথ্যের জন্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *ব্রাহ্মসমাজের ২৫ বছরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত* (কলকাতা, ১১ই মাঘ ১৩৬০) এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর 'অক্ষয়কুমার দত্তের কাছে

বাঙালির ঋত' (দ্র. *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা, রেনেসাঁস পাবলিশার্স, ৩১শে জানুয়ারি ২০০৬) দেখা যেতে পারে।

২৪. Peary Chand Mittra, *David Hare*, Kolkata, Radiance, 2002, p. 81-82

২৫. *Ibid*, p. 82-83

২৬. *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬২

২৭. যোগীন্দ্রনাথ বসু, *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯২৫, পৃ. ১৩৭

২৮. রাজকুমার চক্রবর্তী, *অক্ষয়কুমার দত্ত*, কলকাতা, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, ১৩৩২, পৃ. ২৫

২৯. যোগীন্দ্রনাথ বসু, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৮

৩০. অক্ষয়কুমার ইতোমধ্যে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* লিখেছিলেন, 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশাল', 'স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস', 'ভারতবর্ষীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষানুশীলন', 'বঙ্গভাষার উন্নতির প্রতিবন্ধক' প্রভৃতি মূল্যবান প্রবন্ধ।

৩১. অক্ষয়কুমার *বিদ্যাদর্শন* পত্রিকায় লিখেছিলেন 'হিন্দু স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা', 'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস', 'হিন্দু স্ত্রীদিগের দুঃখমোচনীয় সংবাদ' প্রভৃতি।

৩২. অক্ষয়কুমার দত্তের দুটি বিখ্যাত বই– *বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধবিচার* ও *ধর্মনীতি* প্রথম *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এতে ব্যায়াম শিক্ষার ওপর যেভাবে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তারই প্রভাবে ঠাকুর বাড়িতে ব্যায়ামচর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ের এইসব সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ আছে বর্তমান লেখকের *অক্ষয়কুমার দত্ত ও উনিশ শতকের বাঙলা* (২০০৯) বইতে।

৩৩. যোগীন্দ্রনাথ বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৩৪. *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

৩৫. *ঐ*, পৃ. ৮৬

৩৬. *ঐ*, পৃ. ৮৫

৩৭. *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৩৮. *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২

৩৯. *ঐ*, পৃ. ৮৫-৬

৪০. *ঐ*, পৃ. ৯০

৪১. *ঐ*, পৃ. ৯০-৯১

৪২. *ঐ*, পৃ. ৯১

৪৩. *ঐ*, পৃ. ৯৩

৪৪. *ঐ*, পৃ. ৯১

৪৫. প্রমথ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১২

৪৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, 'কপট ধর্ম্মের বিষয়', *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, ৫১ সংখ্যা, কার্তিক ১৭৬৯ শক, পৃ. ১০৩

৪৭. অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* (দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ), কলকাতা, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, ১৩১৪, পৃ. ৩১৯

৪৮. মহেন্দ্রনাথ রায় উদ্ধৃত, *বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত*, কলকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, ১২৯২, পৃ. ২২৮

৪৯. *ঐ*, পৃ. ৭৭

৫০. যোগীন্দ্রনাথ বসু উদ্ধৃত, 'অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলা সাহিত্য', দ্র. *বিজ্ঞান-বুদ্ধি চর্চার অগ্রপথিক অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাঙালি সমাজ* (সম্পাদক, মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম), কলকাতা, রেনেসাঁস পাবলিশার্স, ৩১শে জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৯২

৫১. দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৮০

৫২. অমলেশ ত্রিপাঠী, *ইতালীর র‍্যনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, মার্চ ২০১২, পৃ. ৭৯

৫৩. শ্যামলী সুর, *ইতিহাসচিন্তার সূচনা জাতীয়তাবাদে উন্মেষ*, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃ. ১১

৫৪. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*-৩, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ বৈশাখ ১৪০১, পৃ. ৪৪৫-৪৪৬

৫৫. *শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩

৫৬. প্রমথ চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪

৫৭. *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২

———